সত্যের প্রকাশ

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহঃ)

মানুষ নিজের শক্তিকে চেনে না বলেই ফেরেশতা
হতে চায়। নিজেকে চিনতে পারলে
সে মানুষ হতে চাইতো।

সূফী

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক একটি সংকলন

জ্যৈষ্ঠ ১৪২২, মে ২০১৫, রজব ১৪৩৬

** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ প্রণীত হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরির (রহঃ) সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনকেন্দ্রিক কথোপকথন "সংলাপ সমগ্র" গ্রন্থটি পুনরায় ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক সংকলন 'সূফী'-তে ধারাবাহিক ছাপা হচ্ছে। তাঁর (প্রফেসর হারুন-উর-রশিদ) সদয় অনুমতি নিয়েই আপনাদের সামনে আবার 'সংলাপ'গুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। **

'হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে'

আমীন : হুজুর, আমার এক বন্ধু জানতে চেয়েছেন, আল্লাহ চিন্তা করেন কিনা অর্থাৎ তিনি চিন্ময় কিনা। আমি কথাটার উত্তর দেইনি। আমার মনে খানিকটা রাগ হয়েছে, কিন্তু তাকে বুঝতে দেইনি।

গুরু : এতে রাগ করার কী আছে। আল্লাহকে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার বা বিচার করার অধিকার তো সকলেরই আছে। আমাদের নিজেদের সত্তার দুটি দিক একটি মৃন্ময় অন্যটি চিন্ময়। সুতরাং আমার যা আছে সেটা আল্লাহর আছে কিনা এ প্রশ্ন তো একজন করতেই পারে। কিন্তু মানুষকে মনে রাখতে হবে তার কতোগুলো সীমাবদ্ধতা আছে। আমি বুদ্ধি দিয়ে কিছু কিছু জিনিস অবশ্যই বুঝতে পারি। কিন্তু সেই অহঙ্কারে যদি বলে বসি, সব কিছুকেই আমি আমার সীমিত বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় উপলব্ধির আলোকে দেখবো তা হলে ভুল করবো। এই যেমন ধরো, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে বিরাটত্ব এটা আমি আমার আক্‌ল বা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারবো না। বোঝা সম্ভব নয়। কারণ, আমি এখনো আলোর গতিবেগে ভ্রমণের কথা কল্পনাই করতে পারি না। অন্যদিকে পদার্থের ক্ষুদ্রতম এককটি কী তাও আমি বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি না। পরমাণুর ক্ষুদ্রতম অংশের সন্ধান করতে করতে কোয়ার্ক পর্যন্ত পৌঁছেছি– কিন্তু অনুসন্ধানের শেষ হয়েছে একথা বলতে পারছি না।

সুতরাং আমরা যে চিন্তাশক্তিকে নিয়ে অহঙ্কার করি তার একটা সীমাবদ্ধতা আছে– কারণ এই চিন্তার ক্ষমতাকে সম্বল করে যখন এমন কিছুকে দেখতে চাই– যা আমাকেসহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে আছে, সমস্যাটা হয় তখনই। [সুরা নিসা, আয়াত নং-১২৬]। তাঁকে তাঁর সমগ্রতায় আমি আমার মানবিক শক্তিসামর্থ্য দিয়ে কখনই উপলব্ধি করতে পারবো না। তাকে অস্বীকার করতে পারি– তাতে তিনি মিথ্যা হয়ে যাবেন না। চোখ বুজলে অন্ধকার হয়– সে অন্ধকার আমার নিজের– এই অন্ধকার দেখতে পাওয়াটাও আমার একটা ক্ষমতা। এই ক্ষমতার বলে যদি বলে বসি সূর্য বলে কিছু নেই, তাহলে সূর্যটা মিথ্যে হয়ে যায় না। আমার নিজের অজ্ঞানতাই প্রকাশ হয় মাত্র। তোমার বন্ধুর প্রশ্নটা ছিল, আল্লাহ চিন্তা করেন কি-না। কুরআনসহ সমগ্র আসমানি গ্রন্থকে যদি সত্য বলে মানি তবে আল্লাহ চিন্তা করেন না এমন ভাবার তো কোনো কারণ নেই। তবে তিনি আমার তোমার মতো চিন্তা করেন না একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। যিনি ত্রিকালদর্শী– যিনি সময়কে ধারণ করে আছেন তাঁর চিন্তা তোমার আমার চিন্তা থেকে পৃথক তো হবেই। আমরা দেখছি একটা অন্তহীন রূপান্তরকে– প্রতিটি দৃশ্যমান বস্তু প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে। সে পরিবর্তন সূক্ষ্ম, কিন্তু অমোঘ, অন্তহীন। এই দৃশ্যপটের একটা অতি ক্ষুদ্র অংশকে দেখে আমি উপলব্ধি করছি– চিন্তা করছি। যিনি সমগ্র দৃশ্যটা দেখছেন তিনি অবশ্যই আমার চেয়ে বেশি দেখছেন, বেশি চিন্তা করছেন। দেখো, জ্ঞানার্জন আমার জন্য ফরজ করা হয়েছে। কিন্তু যে জ্ঞান নিজের অজ্ঞানতাকে পরিমাপ করতে জানে না সে জ্ঞান কোনো জ্ঞানই নয়। জ্ঞান বলতে একদল লোক বড়াই করে বলে, এই দেখো আমি কতোটা বেশি জানি। আদর্শ জ্ঞানী কিন্তু বিনম্র মহত্ত্বে বলেন– কিছুই জানা হলো না। একটা প্রদীপ জ্বাললে একজন অহঙ্কার করতে পারে কতোটা জায়গা জুড়ে আলো ছড়ালো সেটা দেখে। অন্যজন কিন্তু অন্ধকারের ব্যাপকতাকে দেখে আলোর ক্ষুদ্রত্বকে উপলব্ধি করতে পারে। মানুষের এই চিন্তাশক্তি তাকে অতি সহজেই অন্ধ করে দিতে পারে। চিন্তা মানে হচ্ছে একটা জঙ্গমতা– যা মুক্ত, স্বাধীন এবং সচল। কিন্তু চিন্তার অহঙ্কার হলো একটা স্থবিরতার নাম। চিন্তা যখন একটা চেনাবৃত্তে আটকে যায় তখন সে আর বৃত্তের বাইরে যেতে পারে না। চিন্তারও তখন মৃত্যু হয়। কিন্তু চিন্তাশক্তিরহিত এই মানুষটিও তার চিন্তা নিয়ে বড়াই করে। যে মানুষটি স্বতঃসিদ্ধ সূত্র মেনে নিয়ে অংক কষে– সেও কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ সূত্রকে অংকের জন্য মানতে রাজি আছে। তাকে যদি বলো স্রষ্টাও তেমনি একটি স্বতঃসিদ্ধ সূত্র সে তা মানবে না। অথচ স্বতঃসিদ্ধ সত্য, এ ছাড়া স্রষ্টার কোনো পরিচয়ই সত্য নয়। আর কোনোভাবেই তাকে তুমি ব্যাখ্যা করতে পারবে না। সে জন্যই আধ্যাত্মিক জগতে কিছু লোক আছেন যারা চিন্তা দিয়ে নয়– হৃদয় দিয়ে স্রষ্টাকে উপলব্ধি করেন। বিমুগ্ধচিত্তে তেমন প্রেমিক বলে ওঠেন–

তেরা হুসন সে মুঝে কেয়া গরজ
তেরি জাত সে মেরা ইশক হ্যায়
তুঝে দেখনে কি হ্যায় আরজু
তু খোঁজা মে হো কে বাহার মে।

[তোমার রূপে আমার কী বা আসে যায়
তোমার সত্তার প্রেমে পাগল আমি
তোমাকে দেখার বাসনায় উদ্বেল আমি
তা তুমি শরতেই থাকো কিংবা বসন্তে]

হৃদয় দিয়ে যখন তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করবে তখন দেখবে সে বাইরে কোথাও নয়; তোমার হৃদয়ের মাঝেই লুকিয়েছিল।

আমীন : হুজুর, আমার নিজেরও চিন্তার আবিলতা অনেকটা কাটলো। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ■

মেরাজ রজনী প্রসঙ্গে

অধ্যক্ষ হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল জলিল

আরবি অর্থ সিঁড়ি, উর্ধ্বগমন, আরোহণ । 'আইন' 'রা' 'জিম' ধাতু থেকে শব্দটির উৎপত্তি, বহুবচনে মা'আরিজ। নবী করিম (সা.)-এর মোজেজাসমূহের মধ্যে মেরাজ গমন একটি বিস্ময়কর মোজেজা। এ জন্যই মেরাজের ঘটনা বর্ণনা করার আয়াতের শুরুতেই আল্লাহ্ পাক 'সোবহানাল্লাহ্' শব্দটি ব্যবহার করেছেন যা আশ্চর্যজনক ঘটনার সময়ই ব্যবহার করা হয়। সশরীরে মেরাজ গমনের প্রাণস্বরূপ কুরআনের 'বিআব্‌দিহি' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা 'আব্‌দুন' শব্দটি দ্বারা বুঝানো হয় রুহ ও দেহের সমষ্টিকে। তদুপরি বোরাক প্রেরণ ও বোরাক কর্তৃক নবী করিম (সা.)-কে বহন করে নিয়ে যাওয়ার মধ্যেও সশরীরে মেরাজ গমনের প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বপ্নে বা রুহানিভাবে মেরাজের দাবি করা হলে কোরাইশদের মধ্যে এতো হৈ চৈ হতো না। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পূর্ববর্তী সকল ইমামই সশরীরে মেরাজ গমনের কথা স্বীকার করেছেন । মেরাজের ঘটনাটি নবীজীর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, এর সাথে গতির সম্পর্ক এবং সময় ও স্থানের সঙ্কোচনের তত্ত্ব জড়িয়ে আছে। সূর্যের আলোর গতি সেকেন্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। পৃথিবীতে সূর্যের আলো পৌঁছাতে সময় লাগে আট মিনিট বিশ সেকেন্ড। এ হিসাবে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল। অথচ নবী করিম (সা.) মুহূর্তের মধ্যে চন্দ্র, সূর্য, সিদরাতুল মুনতাহা, আরশ-কুরসি ভ্রমণ করে লা-মাকানে খোদার দিদার লাভ করে নব্বই হাজার কালাম করে পুনরায় মক্কা শরিফে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন বিছানা এখনো গরম রয়েছে। এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী হতে পারে? নবী করিম (সা.)-এর গতি কতো ছিল– এ থেকেই অনুমান করা যায়। কেননা তিনি ছিলেন নূর। মেরাজের মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– অন্য নবীদের সমস্ত মোজেজা নবী করিম (সা.)-এর মধ্যে একত্রিত হয়েছিল। হযরত মুসা (আ.) তুর পর্বতে খোদার নামে কালাম করেছেন। হযরত ঈসা (আ.) সশরীরে আকাশে অবস্থান করেছেন এবং হযরত ইদ্রিস (আ.) সশরীরে বেহেশতে অবস্থান করছেন। তাঁদের চেয়েও উন্নত মকামে বা উচ্চমর্যাদায় আল্লাহ্ পাক নবী করিম (সা.)-কে নিয়ে সবার ওপরে তাঁকে মর্যাদা প্রদান করেছেন। মুসা (আ.) নিজে গিয়েছিলেন তুর পর্বতে। আর আমাদের প্রিয় নবী করিম (সা.)-কে আল্লাহ্‌তায়ালা দাওয়াত করে বোরাকে চড়িয়ে ফেরেশতাদের মিছিল সহকারে বায়তুল মোকাদ্দাসে নিয়েছিলেন। সেখানে সমস্ত নবীকে সশরীরে উপস্থিত করে হুজুর করিম (সা.)-এর মোক্তাদি বানিয়েছিলেন। সেদিনই সমস্ত নবীর ইমাম থেকে নবী করিম (সা.) 'নবীদেরও নবী' বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছিলেন। সমস্ত নবী অষ্টাঙ্গ (দুই হাত, দুই পা, দুই হাঁটু, নাক ও কপাল) দিয়ে সশরীরে নামাজ আদায় করেছিলেন সেদিন। সমস্ত নবী সশরীরে জীবিত, তারই বাস্তব প্রমাণ মিলেছিল মেরাজের রাতে।

'সমস্ত নবী আপন আপন রওজায় জীবিত আছেন'– হাদিস।

মেরাজের রাতে নবী করিম (সা.)-কে প্রথম সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল জিব্রাইল, মিকাইল ও ইস্রাফিল ফেরেশতাত্রয়ের অধীনে সত্তর হাজার ফেরেশতা দিয়ে। দ্বিতীয় সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল নবী (আ.)-দের মাধ্যমে। তৃতীয় সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল আকাশের ফেরেশতা ও হুর দিয়ে এবং চতুর্থ ও শেষ সংবর্ধনা দিয়েছিলেন স্বয়ং আল্লাহ্‌তায়ালা। সিদ্‌রাতুল মুনতাহা ও আরশ মোয়াল্লা অতিক্রম করার পর স্বয়ং আল্লাহতায়ালা একশ বার সংবর্ধনামূলক বাক্য 'হে প্রিয় বন্ধু মুহম্মদ, আপনি আমার অতি কাছে আসুন'– বলে নবী করিম (সা.)-কে সম্মানীত করেছিলেন। কুরআন মজিদে "সুম্মা দানা ফাতাদাল্লা" আয়াতটি এদিকেই ইঙ্গিতবহ বলে তাফসিরে মুগ্‌নি ও মিরসাদুল ইবাদ গ্রন্থদ্বয়ের বরাত দিয়ে রিয়াজুন্নাসেহিন কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত কিতাবখানা সাতশ বছর পূর্বে ফারসি ভাষায় লিখিত। লেখকের কাছে কিতাবখানা সংরক্ষিত আছে।

মিরাজের ঘটনা ঘটেছিল ১১ বছর ৫ মাস ১৫ দিনের মাথায়। অর্থাৎ প্রকাশ্য নবুয়তের ২৩ বছর দায়িত্ব পালনের মাঝামাঝি সময়ে। সে সময় হুজুর (সা.)-এর বয়স হয়েছিল ৫১ বছর ৫ মাস ১৫ দিন। সন ছিল নবুয়তের দ্বাদশ সাল। তিনটি পর্যায়ে মেরাজকে ভাগ করা হয়েছে। মক্কা শরিফ থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত মেরাজের অংশকে বলা হয়ে ইস্‌রা বা রাত্রিভ্রমণ। বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে সিদ্‌রাতুল মুনতাহা পর্যন্ত অংশকে বলা হয় মেরাজ। সিদ্‌রাতুল মুনতাহা থেকে আরশ ও লা-মাকান পর্যন্ত অংশকে বলা হয় ই'রাজ; কিন্তু সাধারণভাবে পূর্ণ ভ্রমণকেই এক নামে অর্থাৎ 'মেরাজ' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কুরআন, হাদিসে মোতাওয়াতির এবং খবরে ওয়াহে দ্বারা যথাক্রমে এই তিনটি পর্যায়ের মিরাজ প্রমাণিত।

রজব চাঁদের ২৭ তারিখ সোমবার পূর্ব রাত্রের শেষাংশে নবী করিম (সা.) বায়তুল্লায় অবস্থিত বিবি উম্মে হানি (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন। বিবি উম্মে হানি (রা.) ছিলেন আবু তালেবের কন্যা এবং নবী করিম (সা.)-এর দুধবোন। উক্ত গৃহটি ছিল বর্তমান হেরেম শরিফের ভেতরে পশ্চিম দিকে। হযরত জিবরাইল (আ.) ঘরের ছাদ দিয়ে প্রবেশ করে নূরের পাখা দিয়ে, অন্য রেওয়ায়েত মোতাবেক– গণ্ডদেশ দিয়ে নবী করিম (সা.)-এর কদম মোবারকের তালুতে স্পর্শ করতেই হুজুরের তন্দ্রা টুটে যায়। জিবরাইল (আ.) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দাওয়াত জানালেন এবং নবীজীকে জমজমের কাছে নিয়ে গেলেন। সিনা মোবারক বিদীর্ণ করে জমজমের পানি দিয়ে ধৌত করে নূর এবং হেকমত দিয়ে পরিপূর্ণ করলেন। এভাবে মহাশূন্যে ভ্রমণের প্রস্তুতিপর্ব শেষ করলেন।

কাছেই বোরাক দণ্ডায়মান ছিল। বোরাকের আকৃতি ছিল অদ্ভুত ধরনের। গাধার চেয়ে উঁচু, খচ্চরের চেয়ে নিচু, মুখমণ্ডল মানুষের চেহারাসদৃশ, পা উটের পায়ের মতো এবং পিঠের কেশর ঘোড়ার মতো (রুহুল বয়ান-সুরা ইসরা)। মূলত বোরাক ছিল বেহেশতি বাহন– যার গতি ছিল দৃষ্টি সীমান্তে মাত্র এক কদম। নবী করিম (সা.) বোরাকে সওয়ার হওয়ার চেষ্টা করতেই বোরাক নড়াচড়া শুরু করলো। জিবরাইল (আ.) বললেন– 'তোমার পিঠে সৃষ্টির সেরা মহামানব সওয়ার হচ্ছেন– সুতরাং তুমি স্থির হয়ে যাও'। বোরাক বললো, কাল হাশরের দিনে নবী করিম (সা.) আমার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে শাফায়াত করবেন বলে ওয়াদা করলে আমি স্থির হবো। নবী করিম (সা.) ওয়াদা করলেন। বোরাক স্থির হলো। তিনি বোরাকে সওয়ার হলেন। জিবরাইল (আ.) সামনে লাগাম ধরে, মিকাইল (আ.) রিকাব ধরে এবং ইসরাফিল (আ.) পেছনে পেছনে অগ্রসর হলেন। পেছনে সত্তর হাজার ফেরেশতার মিছিল। এ যেন দুলহার সাথে বরযাত্রী। প্রকৃতপক্ষে নবী করিম (সা.) ছিলেন আরশের দুলহা (তাফসিরে রুহুল বয়ান)।

মক্কা শরিফ থেকে রওনা দিয়ে পথিমধ্যে মদিনার রওজা মোবারকের স্থানে গিয়ে বোরাক থামলো। জিবরাইলের ইশারায় সেখানে তিনি দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন। এভাবে ঈসা (আ.)-এর জন্মস্থান বাইতুল লাহাম এবং মাদ্‌ইয়ান নামক স্থানে শুয়াইব (আ.)-এর গুহের কাছে বোরাক থেকে নেমে নবী করিম (সা.) দু'রাকাত করে নামাজ আদায় করলেন। এজন্যই বরকতময় স্থানে নামাজ আদায় করা সুন্নত। এই শিক্ষাই এখানে রয়েছে। নবী করিম (সা.) এরশাদ করেন, আমি বোরাক থেকে দেখতে পেলাম– হযরত মুসা (আ.) তাঁর মাজারে (জর্দানে) দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছেন।

অতঃপর জিবরাইল (আ.) বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদের সামনে বোরাক থামালেন। সমস্ত নবী আগে থেকেই সেখানে সশরীরে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জিবরাইল (আ.) বোরাককে রশি দিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাসে সাখ্‌রা নামক পবিত্র পাথরের সাথে বাঁধলেন এবং আজান দিলেন। সমস্ত নবী (আ.) নামাজের জন্য দাঁড়ালেন। হযরত জিবরাইল (আ.) নবী করিম (সা.)-কে মোসল্লাতে দাঁড় করিয়ে ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করলেন। হুজুর (সা.) সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সত্তর হাজার ফেরেশতাকে নিয়ে দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন। তখনো কিন্তু নামাজ ফরজ হয়নি। প্রশ্ন জাগে– নামাজের আদেশ নাজিল হওয়ার আগে হুজুর (সা.) কিভাবে ইমামতি করলেন? বুঝা গেলো– তিনি নামাজের নিয়মকানুন আগেই জানতেন। নামাজের তা'লিম তিনি আগেই পেয়েছিলেন; তানজিল বা নাজিল হয়েছে পরে। আজকে প্রমাণিত হলো– নবী করিম (সা.) হলেন ইমামুল মুরসালিন ও নবীউল আম্বিয়া (আ.)। নামাজ শেষে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত সভায় নবীরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে বক্তব্য পেশ করলেন। সর্বশেষ সভাপতি (মির মজলিস) হিসেবে ভাষণ রাখলেন নবী করিম (সা.)। তাঁর ভাষণে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা করে তিনি বললেন– 'আল্লাহ্ পাক আমাকে আদম সন্তানদের মধ্যে সর্দার, আখেরি নবী ও রাহ্‌মাতুল্লিল আলামিন বানিয়ে প্রেরণ করেছেন।' ■

হৃদয়ের মাকামসমূহ

সদ্‌গুণ সমূহেরও স্থান হলো কালব্। জ্ঞানের উঁচু যে মাকাম বা মূল নির্যাস (উসুল আল ইলম) গ্রহণের জায়গাও এটি। ঠিক যেরকম ঝরনা থেকে পানি বের হয়ে নির্গমন করে কোনো হ্রদে ঠিক তেমনি জ্ঞানের নির্যাস বের হয় কালব্ থেকে এবং তা প্রবাহিত হয় অন্তরের বাহিরের দিকে, সাদরে। এই কলব্ বা প্রকৃত হৃদয় থেকেই উৎসারিত হয় ইয়াকিন, সত্যিকারের জ্ঞান এবং নিয়্যত। কালব্ মযদি শিকড় হয় তবে প্রথম মাকাম সাদর হলো এর শাখার মতো এবং আমরা জানি বৃক্ষের শাখারা তখনই সবল এবং মজবুত হতে পারে যদি শিকড় সুদৃঢ় হয়।

আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর শান্তি এবং আশিষ তার ওপরে বর্ষিত হোক, বলেছেন, "কর্ম কেবল তার নিয়্যতের ওপরে প্রতিষ্ঠিত" এবং এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তির দ্বারা যে কর্ম সাধিত হয় তা বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে পারে এই কর্মের মূলে যে নিয়্যত তার মাধ্যমে। কর্ম ব্যক্তিকেন্দ্রিক ; ব্যক্তির কর্তৃত্ব কলবের নিয়্যতের মাধ্যমে সাদরের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহর রহমতে কলব্ নাফসের অধীনে থাকে না কেননা কলব্ হলো রাজা এবং নাফস হলো তার রাজত্ব। আল্লাহর রাসুল বলেছেন : "হাত হলো এক সৈন্য দলের দুটো ডানার মতো, দুই পা হলো বার্তাবাহক, দুই চোখ হলো ভালোমন্দের দেখভালকারী, দুই কান হলো দমনকারী, যকৃত বা কলিজা হলো করুণা, প্লীহা হলো মেজাজ, দুই কিডনি হলো ধূর্ত এবং ফুসফুস হলো প্রসারণ স্বাধীনতা। যদি রাজা গুণী এবং ধর্মনিষ্ঠ হন তাহলো তার প্রজারা হবে ধর্মনিষ্ঠ; অন্যথায় রাজা নীতিভ্রষ্ট হলো প্রজারাও হবে তেমনি নীতিভ্রষ্ঠ।" এভাবে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আল্লাহর রাসুল বলেছেন : কলব হলো রাজা এবং অশ্বারোহীর কাছে মাঠ যেরকম সাদর হলো কলবের কাছে তেমনি।

তিনি আরো বলেছেন শরীরের বাকি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য, ভালো ও মন্দ নির্ভর করে কলবের ওপরে। যেকোনো কর্ম যা কেবল নফস থেকে উৎসারিত অথচ অন্তরের থেকে বিচ্ছিন্ন তা আখেরাতের বিচারে মূল্যহীন। জবাব দিতে হবে সেই সব কর্মের জন্য যেখানে হৃদয় উপস্থিত। যদি কলবের ভূমিকা ছাড়া কোনো সৎকাজও করা হয় তার পুরস্কার থাকবে না শেষ বিচারের দিনে আবার কলবের ভূমিকা ছাড়া কোনো অসৎকাজ করা হলেও (যেমন কাউকে বাধ্য করা খারাপ কাজ করার জন্য যা তার অন্তরে সায় দেয়নি) তবে সেই কাজটির জন্যও শাস্তি থাকবে না শেষ বিচারে।

এই কলব্ই হলো কুরআনের ভাষায় আল নাফস আল মুলহামা বা অনুপ্রাণিত নাফসের ধারক।

অন্তরের অন্তর বা ফু'য়াদ হলো চোখের কালো অংশের ভেতরে আবার যে সূক্ষ্ম চোখের মণি বা চোখের পুতলি থাকে তার অথবা একটি ফলের যে বীজ তার ভেতরের শাঁসের সমতুল্য। ফু'য়াদ হলো মারেফতের আসন, যে চিন্তা আসা-যাওয়ার মধ্যে থাকে, দিব্যদৃষ্টি বা ভিশন তারও স্থান। সাদরের মধ্যমণি হলো কালব্ আর কালবের মধ্যমণি হলো ফু'য়াদ, ঠিক যেরকম ঝিনুকের খোলসের আবরণের ভেতরে মাংস আর সেই মাংসের ভেতরে জন্ম নেয় মুক্তা।

ফুয়াদই হলো আল নাফস আল লাওয়াম্মাহ বা মন্দকাজের প্রতি ভর্ৎসনার ধারক যাকে আমরা বলতে পারি সচল বিবেক, যে ভালোমন্দের পার্থক্য জানে এবং নাফসকে পরিচালনা করতে পারে বা নাফস খারাপ কিছুর দিকে ঝুঁকলে বা কিছু করলে তার ভেতরে অনুশোচনার জন্ম দেয়, তাকে খারাপ কাজে বিরতও রাখে। হৃদয়ের চতুর্থ মাকামের নাম লুব্ যার মেটাফিজিক্যাল অবস্থান ফু'য়াদের গভীরে– এবং এটি অনেকটা চোখের ভেতরের যেখানটা আলোর প্রতি সংবেদনশীল তার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এই লুব্ হলো নূর আল তাওহিদ বা একত্ববাদের যে আলো তার ধারক, যার লুব্ সক্রিয় তাকে বলা হয় মুয়াহিদ, যে একত্বকে ধারণ করেছে; এই লুব্ আল্লাহর রহমত ও করুণার আশ্রয়দাতা এবং নাফস আল মুতমায়িন্নাহ বা প্রশান্ত ও সন্তুষ্ট আত্মার অর্জনকারী।

হৃদয়ের এই প্রতিটি মাকাম তার পরের মাকামকে ঢেকে রাখে। প্রতিটি মাকামের সাথে অন্য মাকামের সম্পর্ক আছে এবং তারা অনেকটা একসাথে কাজ করে, ঠিক যেরকম চোখের বিভিন্ন অংশগুলো।

লুবের পরে আরো সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর মাকাম হয়েছে যাদের বলা হয় মাকাম আল লাতিফাহ, এদের সবার মূল হলো নূর আল তাওহিদ এবং তাওহিদ একটি নিগূঢ় রহস্য এবং মারেফাত বা তার উপলব্ধি হলো স্রষ্টা একটি বিশেষ আশীর্বাদ। বিশ্বাস হলো সেই নিগূঢ় রহস্যকে রক্ষা করা, ইসলাম হলো স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানানো তাঁর সকল আশীর্বাদের জন্য এবং একই সাথে অন্তর বা হৃদয়কে তাঁর রহস্যের কাছে সমর্পণ করা। একত্ববাদ বা তাওহিদ এক অসীম রহস্য যার দিকে একমাত্র তিনিই পারেন তাঁর বান্দাকে পরিচালনা করতে কেননা আমাদের বিচারবুদ্ধি (আকল) কখনো তার নাগাল পায় না যদি না একমাত্র স্রষ্টার তরফ থেকে সাহায্য এবং পরিচালনা পাওয়া যায়।

মারেফত একটি আশীর্বাদের দরজা যা আল্লাহ খুলে দিতে পারেন এমনও সময়ে যখন বান্দা এর যোগ্য নয়। বান্দার পক্ষে স্রষ্টার পরিপূর্ণতা বুঝতে পারার যোগ্যতা নেই, থাকে না। বান্দা যা করতে পারে যে, এটা জানা যে তিনি এক এবং অদ্বিতীয় এবং তাঁর সাথে আর কোনো কিছুর উপমা, তুলনা প্রদান থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা, তাঁর প্রকৃতির সাথে অন্য কোনো প্রকৃতিকে আরোপ করা বা তাঁকে অ-ন্যায়বান হিসেবে মনে করা।

ব্যক্তির জন্য এই হাকিকত বা বিশেষ বাস্তবতা অনুধাবন করা আবশ্যক নয়। বান্দাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে অন্তরে বিশ্বাস রাখা, তাকে সব কিছু বোঝার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়নি কেননা মানুষকে দুর্বল হিসেবে তৈরি করা হয়েছে এবং নিশ্চিতভাবে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হাকিকত বোঝার জন্য আকল বা আমাদের বুদ্ধিমত্তা যথেষ্ট নয়। বান্দার দায়িত্ব অনুসরণ করা এবং নফসের জন্য সমর্পণই যথেষ্ট। আল মাকাম আল মাসকুতানহা বা ব্যাখ্যার অতীত আরো যে মাকাম রয়েছে তার আল্লাহর বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত বান্দারা যাদের তা অনুধাবন করার অনুমতি দেয়া হয়েছে তাদের জন্য সংরক্ষিত। ■

এক নজরে হৃদয়ের মাকামসমূহ

	সাদর হৃদয়ের প্রথম মাকাম	কলব্ হৃদয়ের দ্বিতীয় মাকাম	ফু'য়াদ হৃদয়ের তৃতীয় মাকাম	লুব্ হৃদয়ের চতুর্থ মাকাম
প্রবেশ স্থল	ইসলামের আলো	ইমানের আলো	মারেফতের আলো	তাওহিদের আলো
ব্যক্তিত্ব	মুসলিম	মু'মিন	আরেফ	মুয়াহিদ
জ্ঞানের ধরন	শরিয়াহ বা সীমারেখার বাহ্যিক জ্ঞান	অভ্যন্তরীণ জ্ঞান	অন্তরদৃষ্টির জ্ঞান	স্রষ্টার তরফ থেকে বিশেষ জ্ঞান
নফস	আল নফসাল আম্মারা, যে নফস পরিচালনা করে	আল নফসাল মুলহামা, যে নফস অনুপ্রেরণা দেয়	আল নফস আল লাওয়াম্মাহ, যে নফস মন্দে প্রতি ভর্ৎসনা করে (সচল বিবেক)	আল নাফস আল মুতমায়িন্নাহ বা প্রশান্ত ও সন্তুষ্ট আত্মা

হৃদয়ের মাকামসমূহ

সাদিক মোহাম্মদ আলম

১.
অসম্ভব রকমের ক্রন্দনরত এক পাগল ধরনের মানুষকে দেখে একজন প্রশ্ন করলো:
তুমি এভাবে কাঁদছ কেন?
পাগল উত্তর দিলো: "আমি সেই একজনার হৃদয়কে আকর্ষণের জন্য কাঁদছি।"
প্রশ্নকারী ভর্ৎসনার সুরে বলে উঠলো: "সে আবার কেমন কথা? তুমি জানো না স্রষ্টার ঠিক মানুষের মতো হৃদয় নেই?"
পাগল বলে উঠলো: "আসলে তুমি নিজেই আবোল তাবোল বকছো। যদি তুমি বুঝতে, তবে জানতে যে এ মহাবিশ্বে যতো হৃদয় রয়েছে সে সবগুলোর অধিকর্তা হচ্ছেন সেই একজনা এবং তোমার হৃদয়ের মাধ্যমেই তুমি কেবল তাঁর সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে পারবে।"

২.
আল হাকিম আল তিরমিযি নবম শতাব্দীর একজন সুফি মরমী এবং লেখক ছিলেন যাকে মনে করা হয় "বায়ান আল ফারক বায়ান আল সাদর ওয়া আল কালব ওয়া আল ফুয়াদ ওয়া আল লুব্ব"-এর রচয়িতা হিসেবে, যদিও সেক্ষেত্রে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে কোনো কোনো পণ্ডিতদের। কিন্তু কার হাতে লেখা সেই বিতর্কে না গেলেও আমরা এটা বলতে পারি যে সুফি সাহিত্যের ভেতরে এই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। যে হৃদয় বা অন্তর বা কলব্-কে সুফিরা এতোটা গুরুত্ব দিয়ে থাকেন সেই অদেখা, আধ্যাত্মিক হৃদয়ের নানান দিকসমূহ যার অনেকটাই খুব সূক্ষ্ম– তা নিয়ে এতোটা নিখুঁত ও পরিপূর্ণ বর্ণনা আর খুব কম জায়গাতেই পাওয়া যায়।
মূল আরবি থেকে ইংরেজিতে তরজমা করেছেন মার্কিন অধ্যাপক নিকলাস হির এবং কেনেথ হনেরক্যাম্প এবং থ্রি আর্লি সুফি টেক্ট নামের গ্রন্থে সংযুক্ত করেছেন (প্রকাশক ফনস ভিটা ২০০৩)। এখানে ইংরেজি থেকে বাংলায় লেখাটি তরজমা করা হলো।

৩.
জেনে রাখুন, এবং আল্লাহ আপনার দ্বীনকে বুঝতে পারার ক্ষমতাকে আরো প্রসারিত করুন, যে কলব্ বা হৃদয় একটি খুব অর্থবহ শব্দ এবং অর্থের দিক থেকে এই শব্দের ভেতরে হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ মাকামসমূহ (মাকাম আল বাতিন) অন্তর্ভুক্ত কেননা মানুষের দেহের ভেতরের মাকামগুলো হৃদয়ের বাহির এবং ভেতর দুদিকেই রয়েছে। কলব্ বা হৃদয় শব্দটি অনেকটা চোখের মতো। চোখ বললে আমরা যেমন চোখের পাতা, পাপড়ি, চোখের মণি, চোখের সাদা অংশ এবং এমনকি ভেতরের কর্নিয়া ইত্যাদি বুঝে থাকি। এই যে চোখের বিভিন্ন অংশ যাদের সার্বিকভাবে চোখ বললেই বুঝে নিতে হয় তাদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা হুকুম বা প্রকৃতি রয়েছে এবং রয়েছে আলাদা মা'না বা অর্থ। এর সাথে সাথে যা কিছু বাইরে আছে তার আবার ভেতরের সাথে সম্পর্ক আছে এবং বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ কাজের সহায়কও বটে।
একই রকম উদাহরণ দেয়া যেতে পারে বসতবাড়ি। বাড়ি বললে আমরা শুধু বাড়িটাকে বুঝি না, বুঝি বাড়ির সদর দরজা, উঠোন, বারান্দা, ঘরগুলো, দালান সবগুলোকেই। এখানেও আমরা বুঝতে পারি যে এরা সবাই মিলেই বাড়িটি এবং প্রত্যেক অংশের নিজস্ব কাজ ও ভূমিকা রয়েছে।
জেনে রাখুন, এবং আল্লাহ আপনার দ্বীনকে বুঝতে পারার ক্ষমতাকে আরো প্রসারিত করুন, এই আমাদের যে দ্বীন তার বিভিন্ন স্তর রয়েছে, রয়েছে মাকামসমূহ, যেমন রয়েছে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন মর্যাদার স্তর, রয়েছে যা জ্ঞানের পথে পথিক তাদের আলাদা শ্রেণী। এবং আল্লাহ কুরআনে এরশাদ করছেন : আমি তাদের কাউকে কারো ওপর মর্যাদা দিয়েছি (কুরআন ২: ২৫৩)। আবার তিনি আরেক জায়গায় কুরআনে উল্লেখ করছেন : প্রত্যেক জ্ঞানীর ওপরে আছে অধিকতর এক জ্ঞানীজন। (কুরআন ১২:৭৬)
সুতরাং যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান যতো সূক্ষ্ম এবং উন্নততর তার জন্য হৃদয়ে রয়েছে আরো গুপ্ত, আরো বিশেষভাবে সংরক্ষিত, আরো লুকানো, আরো আবরণে ঢাকা মাকাম। সাধারণভাবে বলা চলে হৃদয় বললে হৃদয়ের ভেতরের সকল মাকামকেই বুঝে নিতে হয়।
সাদর (বুকের ভেতর) বললে হৃদয়ের সেই মাকামকে বুঝানো হয় যা অনেকটা চোখের ক্ষেত্রে, চোখের সাদা অংশটার মতো। এই সাদর হচ্ছে সকল ওয়াসওয়াসার স্থান এবং মনের কষ্টের জায়গা। ঠিক যেরকম চোখে কোনো প্রদাহ হলে, চোখে খুব বেশি পানি গেলে চোখের সাদা জায়গাটা হয়তো লালচে হয়ে যায়, প্রদাহ হয় এবং চোখের আরো অন্যান্য অস্বাভাবিকতা প্রকাশের স্থান হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করে, ঠিক তেমনি সাদর বা হৃদয়ের সবচেয়ে বাইরের মাকামটির ভূমিকা। এবং সাদর বা বাইরের মাকামেই আমাদের হৃদয়ের যাবতীয় অনভিপ্রেত আচরণ বা প্রকাশ যেমন হিংসা, দ্বেষ, আকাঙ্ক্ষা, অতিরিক্ত চাহিদার প্রকাশস্থল। সময় সময় এই সাদর সঙ্কুচিত হয় এবং অন্য সময়ে এটা প্রসারিত হয়। সঙ্কুচিত হলে আমরা খারাপ বোধ করি, আমাদের বুকের ভেতর কষ্ট হয়, অন্যের বা অন্য কিছুর প্রতি নেতিবাচক ধারণার জন্ম নেয় আর প্রসারিত হলে আমরা উৎফুল্ল হই, আমরা সুখ বোধ করি, অন্য মানুষ বা যেকোনো কিছুর প্রতি ইতিবাচক ধারণা নিয়ে মুহূর্ত কাটাতে পারি। এই সাদরের মাধ্যমেই আমাদের নাফস নিজেকে মন্দের দিকে ধাবিত করে যাকে কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে নাফস আল আম্মারা বি আল সু। এই সাদরই হচ্ছে অন্তরে প্রবেশ করার প্রথম স্থান যার মাধ্যমে আমরা নাফসের প্ররোচনায় কখনো অহঙ্কারী হই, কখনো নিজের খেয়ালখুশিতে চলি। এই সাদর থেকেই নাফসের প্ররোচনার উৎপত্তি হয় এবং বিক্ষেপী চিন্তার উৎবেগ হয়।
একই সাথে এই সাদর হলো ইসলামের আলো (নূর) প্রবেশের দ্বার এবং যা কিছু শুনে বা দেখে বা পড়ে শেখা যায় সেই শিক্ষার (আল ইলম আল মাসমু) ধারক। ইসলামের শিক্ষার উদাহরণ দিতে গেলে বলা যায় যে আহকাম বা শরিয়তের হুকুম-সমূহ, সুন্নাহ ইত্যাদি জ্ঞান অন্তরের এই বাহ্যিক প্রথম মাকামে অবস্থান করে। শিক্ষকের কাছে মানুষ যে শিক্ষা গ্রহণ করে তারও স্থান এই একই জায়গা।
এই প্রথম মাকামকে সাদর বলা হয় কেননা দিনের শুরুর ভাগটাকেও আরবিতে একই নামে ডাকা হয়।
হৃদয়ের দ্বিতীয় মাকামকে কালব্ বলা হয়। এটি সাদরের ভেতরে থাকে এবং চোখের সাথে তুলনা করে বলতে গেলে এটি চোখের কালো অংশের মতো। কালব্ হলো ইমানের আসনস্থল যার মধ্যে বিশ্বাসের আলো (নূর আল ইমান) প্রবেশ করে। খুশু (সমর্পণ), তাকওয়া, মাহাব্বা (প্রেম), রিদা (সন্তুষ্টি), ইয়াকিন, খাওফ (ভয়), রা'জা (আশা), সবর এবং কা'না (তৃপ্তি) ইত্যাদি (এরপর পৃষ্ঠা -৩)

■ **প্রধান সম্পাদক :** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ, ■ **নির্বাহী সম্পাদক :** নিশাত বদরুল ■ **অঙ্গসজ্জা :** মেটাকেভ ডেভলপমেন্ট ■ সৈয়দ রশীদ আহমদ মিশন ফাউন্ডেশনের পক্ষে সৈয়দ জুনায়েদ কে দোজা কর্তৃক ৯৪, নিউ ইস্কাটন, বাংলামটর, রমনা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত এবং জিনিয়াস প্রিন্টার্স ৮/১ তেজকুনিপাড়া, ফার্মগেট, ইলিক্রস কলেজ রোড, তেজগাঁও, ঢাকা ১২১৫ থেকে মুদ্রিত।